International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 12-19
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

শ্রীহর্ষ ও তাঁর রচনাশৈলী : নৈষধচরিত কাব্যের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

মিঠুন হাওলাদার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Sriharsha (flourished 12th century) Indian author and epic poet whose Naishadhacharita, or is among the most popular mahakavyas in Sanskrit literature. Composed many works in the field of Sanskrit literature. Sriharsha is the last writer of an artificial Great Epic and in him we should expect the climax of artificiality. He was surpassed all his predecessors by inventing an extremely artificial style, wonderfully polished, elaborately ornate and inflated with all sorts of rhetorical tricks. He has taken the well-known story of Nala and Damayanti from the Mahabharat for his subject. His obvious object was to surpass all previous poets in description, alliteration, figures of speech and elegance of style. While other poets used similes and metaphors, he deals exclusively in exaggerations and hyperboles. While other poets restrict the flights of their imagination within the sphere of possibility, he never puts any restraints on the freaks of his fancy. In spite of his elaborate style and lavish use of ornaments, however, he was failed to produce a poem. He had no depth of emotion, no poetic vision, no lofty ideal of character. His intellect was cool, logical, and analytical.

Key Words: Sriharsha, Naishadha Charita, Mahabharat, Utpreksakavi, Mahakavya, Nala

কালিদাসোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে তুল্য শ্রদ্ধায় যে তিন জন মহাকবির নাম উচ্চারিত হয় তাঁরা হলেন- ‘কিরাতার্জু নীয়ম্’ মহাকাব্যের রচয়িতা ভারবি, ‘শিশুপালবধ’- প্রণেতা মাঘ এবং ‘নৈষধচরিত’ – এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ। সংস্কৃত সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীহর্ষের মধ্যে পান্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও কবিত্বের সমন্বয় লক্ষিত হয়। অলংকৃত মহাকাব্য প্রণেতাদের শেষ স্তম্ভ হলেন তিনি। কবি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার মত অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতেও পারদর্শী ছিলেন। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও শব্দার্থে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রকৃতি প্রেমিক কবির বর্ণনায় প্রকৃতি কখনো স্ব-স্বরূপে, কখনও উদ্দীপন বিভাবরূপে, কোথাও প্রতীকরূপে, কোথাও আবার চেতনাবানরূপে চিত্রিত হয়েছে। কালিদাসোত্তরকালে প্রতিভা ও পান্ডিত্য সমন্বিত মহাকাব্যগুলির মধ্যে মহাকবি শ্রীহর্ষের ‘নৈষধচরিত’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনেরা দন্ডীর মত শ্রীহর্ষের পদলালিত্যের প্রশংসা করেছেন- ‘নৈষধে পদলালিত্যম্’। কাব্যে ব্যবহৃত গীতিধর্মিতাই নৈষধচরিত্রের পদলালিত্যের মূল রহস্য। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী শ্রীহর্ষ সামান্য পরিচিত ঘটনাকে ললিত পদ বিন্যাসে, বর্ণনা চাতুর্যে, রস পরিবেশনের দক্ষতায় যমক –অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে এমন সুন্দর করে তুলেছেন যে এই গ্রন্থকে পন্ডিতগণ ঔষধের মতো হিতকর মনে করেন- ‘নৈষধং বিদ্বদৌষধম্’। কালিদাসের মত মহান ভারতীয়

কবিদের রচনার বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যঞ্জনা-শক্তির পরিচয় শ্রীহর্ষের কাব্যে না থাকলেও, তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা একান্তভাবে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তাঁর পান্ডিত্য প্রদর্শনের শৈলী, অবান্তর বর্ণনার বাহুল্য, অতিরঞ্জিত বিবতির প্রতি অনুরাগ, শাস্ত্রজ্ঞানের ধ্রুপদী আড়ম্বর প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের সমাবেশে কালিদাসের উত্তরসূরিদের মধ্যে শ্রীহর্ষ শ্রেষ্ঠ – "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ক মাঘঃ ক্ক চ ভারবিঃ"। নৈষধচরিত কাব্যটি ভারবি ও মাঘের গুরুভার রচনাদ্বয়কেও অতিক্রম করে গেছেন। শ্রীহর্ষের কবি সুলভ নিসর্গপ্রীতি, কল্পনার চাতুর্য, ভাবের অতিশয়োক্তি, দার্শনিক তত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত প্রভৃতি পন্ডিত পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। নল-দময়ন্তীর প্রেমোপাখ্যানকে অবলম্বন করে মহাকবি শ্রীহর্ষ বাইশটি সর্গে 'নৈষধচরিত' মহাকাব্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন আকর গ্রন্থে নলোপাখ্যান উল্লিখিত বা বর্ণিত হলেও মহাকবি শ্রীহর্ষ মূলতঃ মহাভারতের কাহিনিকে আশ্রয় করেই 'নৈষধচরিত' রচনা করেন। রত্নাকরের 'হরবিজয়' এবং অভিনন্দনের 'রামচরিত' বাদ দিলে এত বড় আলংকারিক মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ। ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নিষধেশ্বর নল এই মহাকাব্যের নায়ক। নৈষধচরিতের মুখ্যরস শৃঙ্গার। মহাকাব্যে বর্ণনীয় বিষয় সমূহ প্রয়োজনানুগ যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। যেমন প্রথম সর্গে উদ্যান বর্ণনা, দ্বিতীয় সর্গে কুন্ডিননগরের বর্ণনা, ঊনবিংশ সর্গে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের বর্ণনা, সূর্যোদয় ও চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা, একবিংশ ও দ্বাবিংশ সর্গে সায়ংসন্ধ্যা বর্ণনা এই মহাকাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কবির রচনায় তাঁর সমসাময়িক কালের সমাজ, সামাজিকের রুচি ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। কবিস্বভাবের সঙ্গে এ সকল মিশে গড়ে ওঠে কবির রচনা রীতি। কালিদাসের পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে এক নতুন রচনারীতির প্রবর্তন হয়। সহজাত প্রতিভার সঙ্গে ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসের সমন্বয়ে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে যে নতুন শৈলীর বিকাশ ঘটে তার পথিকৃৎ হলেন মহাকবি ভারবি। পরবর্তীকালে ভারবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই রচনারীতির উৎকর্ষ সাধন করেন মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ কবি-মনীষী। প্রতিভা ও পান্ডিত্যের সমন্বয়ে সমুদ্ভাসিত 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যে শ্রীহর্ষের রচনানীতি প্রধানতঃ বৈদর্ভী। তবে যুগ ও সমাজের পরিবর্তন বশতঃ এবং কবি – প্রতিভার বিলক্ষণতা হেতু শ্রীহর্ষের বৈদর্ভী রীতি কালিদাসের বৈদর্ভী রীতি থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। কবি নিজেই তাঁর বৈদর্ভী রীতি প্রবণতার কথা প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন স্থলে। যেমন- "ধন্যাসি বৈদর্ভী গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোপি" (৩/১১৬)। আবার

"গুণানামাস্থানীয়ং নৃপতিলকনারীতিবিদিতাং
রসস্ফীতামন্তস্তব চ তব বৃত্তে চ কবিতুঃ।
ভবিত্রী বৈদর্ভীমধিকমধিকণ্ঠং রচয়িতুং
পরিরম্ভক্রীড়াচরণশরণামন্বহমহম্"।। (১৪/৯১)

সরস্বতীর এই উক্তিতেও বৈদর্ভী রীতির প্রতি শ্রীহর্ষের পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয়েছে। তবে আচার্য কুন্তক সুকমার, বিচিত্র এবং মধ্যম ভেদে রীতির পৃথক তিনটি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির সমন্বয়ে পুষ্ট, অলংকার-বহুল, বক্রোক্তিজীবিত মূলক শ্রীহর্ষের রচনারীতিকে বিচিত্র মাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মহাকবি শ্রীহর্ষের প্রতিভার বহুমুখীনতার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর রচনায়। কবির রচনার বহুক্ষেত্রেই বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, তার্কিক ও নৈয়ায়িক।

নৈষধচরিত মহাকাব্যের সর্বত্র তাঁর দর্শনশাস্ত্র পারঙ্গমতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। দার্শনিক প্রজ্ঞা এবং কবি প্রতিভার স্বচ্ছন্দ সম্মেলনের কথা কবি নিজেই ঘোষণা করেছেন-

"সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে

তর্কে বা ময়ি সংবিধাতরি সমং লীলায়তে ভারতী”।[১]

এই কাব্য পাঠের সময় প্রাজ্ঞন্মস্য কোন ব্যক্তি যাতে ছেলে-খেলার সুযোগ না পায় সেজন্য তাঁর রচনার অনেক ক্ষেত্রেই তিনি জটিল গ্রন্থি বিন্যাস করেছেন-

“গ্রন্থগ্রন্থিরিহ ক্বচিৎ ক্বচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্মায়া
প্রাজ্ঞন্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু।”[২]

দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার জটিল তত্ত্বই হল গ্রন্থি। ন্যায়-দর্শনের পরমাণু কারণতাবাদ প্রকাশিত হয়েছে এই শ্লোকে—

“অন্যোন্যসঙ্গমবশাদধুনা বিভাতাং
তস্যাপি তেহপি মনসী বিকসদ্বিলাসে।
স্রষ্টং পূনর্মনসিজস্য তনুং প্রবৃত্ত—
মাদাবির দ্ব্যণুককৃৎ পরমাণযুগ্মম্।।” (৩।১২৫)

মোক্ষ লাভ ও শোকের নিবৃতি তখনই সম্ভব যখন আনন্দাত্মক ব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটবে। বেদান্ত দর্শনের এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে এই শ্লোকে—

“তৎকালমানন্দময়ী ভবন্তী ভবত্তরনির্বচনীয়মোহা।
স মুক্তসংসারিদশারসাভ্যাং দ্বিস্বাদমুল্লাসমভুঙ্ক্তমিষ্টম্।।” (৮।১৫)

জৈনদর্শনে সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান এবং সম্যক্ চরিত্র - এই তিনটি মোক্ষমার্গরূপে কীর্তিত হয়েছে। জৈন দর্শনের এই তত্ত্বকে কবি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন—

“ন্যবেশি রত্নত্রিতয়ে জিনেন যঃ
স ধর্মচিন্তামণিরূজ্ঝিতো যয়া।
কপালি-কোপানলভস্মনঃ কৃতে
তদেব ভস্ম স্বকুলে স্তৃতং তয়া।।” (৯।৭১)

অর্থাৎ বুদ্ধদেব চিন্তামণিতুল্য যে ধর্মকে তিনটি রত্নে (সম্যগ্-দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্রাত্মক রত্নত্রয়ের মধ্যে) সন্নিবেশিত করেছেন, তাকে যে স্ত্রীলোক হর-কোপানলে ভস্মীভূত কামের জন্য ত্যাগ করে, সে সেই ভস্মকে নিজের বংশে ছড়িয়ে দেয়। বৈদিকধর্মদ্বেষী জৈন বা অহৎ-সম্প্রদায়ের মতে জৈন ধর্মের মূল তত্ত্ব হল এই সম্যগ্দর্শনাদি রত্নত্রিতয়। কোন সতী সাধ্বী রমণী কোন কিছুর জন্য ধর্মকে ত্যাগ করেন না। এছাড়া সংখ্য, মীমাংসা, যোগ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনের অজস্র তত্ত্ব শ্রীহর্ষের রচনায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ সপ্তদশ সর্গে কলির উক্তিতে কবি উপস্থাপিত করেছেন চার্বাক দর্শন প্রতিপাদিত বিভিন্ন তত্ত্ব। অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, নাট্যশাস্ত্র, কোশশাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদ্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে কবির অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। এই সকল শাস্ত্রের তত্ত্বকে কবি কখনো দৃষ্টান্তরূপে, কখনো উপমান রূপে, কখনো বা বর্ণনীয় বিষয়ের কিংবা চরিত্রের অনুষঙ্গরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীহর্ষ ছিলেন বর্ণনানিপুণ কবি। বিষয়ের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে প্রথম সর্গে উদ্যান বর্ণনায়, দ্বিতীয় সর্গে দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় এবং কুন্ডিন নগর বর্ণনায়, দশম স্বর্গে স্বয়ম্বর সভার রূপচিত্রণে, অষ্টাদশ সর্গে নল-দময়ন্তীর সম্ভোগচিত্র অঙ্কনে, দ্বাবিংশ সর্গে চন্দ্রোদয় বর্ণনায় কবি-কল্পনার যে স্বাচ্ছন্দ্য ও পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তা বিস্ময়াবহ। কবি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। প্রথম সর্গের উদ্যান (১৭৭-১০৪) এবং সরোবর বর্ণনায় (১।১০৮-১১৭) প্রকৃতি-প্রেমিক কবির প্রকৃতি সচেতনতা বাণীরূপ লাভ করেছে। বিলাসোদ্যানে পত্রপুষ্পে

সুশোভিত বৃক্ষ, কেতকী-চম্পক-স্থলপদ্ম নাগকেশরের শোভা, পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিল কূজন, বাতাসে আন্দোলিত পুষ্পিত লতা প্রভৃতি কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। অচেতন প্রকৃতির উপর মানবোচিত ব্যবহার আরোপের অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে এই মহাকাব্যের বিভিন্ন সর্গে। বনবায়ুকে লতাদের নৃত্যশিক্ষার গুরুরূপে, পুষ্পের সৌরভহারীরূপে, সরসীর জলে বিহারকারীরূপে উপস্থাপিত করে একটি শ্লোকে কবি বলেছেন—

> “লতাবলালাস্য কলাগুরুস্তরু প্রসূনগন্ধোৎকরপশ্যতোহরঃ।
> অসেবতামমুং মধগন্ধবারিণি প্রণীতলীলাপ্লবনো বনানিলঃ।।” (১।১০৬)

চন্দ্র এবং রাত্রিতে যথাক্রমে নায়ক-নায়িকার ব্যবহার আরোপিত হয়েছে এই শ্লোকে—

> “বিশতি যুবতিত্যাগে রাত্রীমুচাং মিহিকারুচং
> দিনমণিমণিং তাপে চিত্তান্নিজাচ্চ যিযাসতি।
> বিরলতরলজিহ্বা বহ্বাহ্বয়ন্ত্যতিবিহ্বলা-
> মিহ সহচরীং নামগ্রাহং রথাঙ্গবিহঙ্গমাঃ।।” (১৯।৩৫)

অন্ধকার ও সূর্যকিরণে বায়স ও শ্যেনপক্ষীর আরোপ (১৯।১২), সন্ধ্যা ও সূর্যকে বধূবররূপে কল্পনা (১৯।২০), সূর্য ও তার রক্তিমায় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার আরোপ (১৯।৪৪) কবির চেতনাকৃত প্রকৃতি-চিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতিকে উদ্দীপন বিভাবরূপে উপস্থাপিত করে কবি রসপরিবেশনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। রাজহংসের মুখে দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা (২।১৭-৪৬) এবং নলের বর্ণনা (৩।২০-৫০) নায়ক-নায়িকার মনে অনুরাগ সৃষ্টির সহায়ক। অষ্টাদশ সর্গে কবি-চিত্রিতা প্রকৃতি এবং সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদান নায়ক-নায়িকার কামকেলি-বিলাসের সহায়ক-রূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়তমের দ্বারা দময়ন্তীর মুখচুম্বন বর্ণনায় শ্রীহর্ষ পদ্মসমূহে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে উপমানরূপে উপস্থাপিত করেছেন—

> “চুচুম্বাস্যমসৌ তস্যা রসমগ্নঃ শ্রিতস্মিতম্।
> নভোমণিরিবাম্ভোজং মধুমধ্যানুবিম্বিতঃ।।” (২০।২৫)

এছাড়া রয়েছে প্রকৃতি চিত্রণে কল্পনা-পারাবার শ্রীহর্ষের স্বকীয় কল্পনা বৈভব। কবি-কল্পিতা প্রকৃতি কখনো উপমানরূপে, কখনো বা মানবজীবনের সুখদুঃখের সমব্যথিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায়, ঊনবিংশ সর্গের প্রভাত বর্ণনায় এবং দ্বাবিংশ সর্গের সন্ধ্যা বর্ণনায় কবি কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিচরণশীলতা লক্ষ্য করা যায়। কবির কল্পনায় প্রভাতে সূর্যোদয়ের অনুপম চিত্র ফুটে উঠেছে এই শ্লোকে—

> “ভৃশমবিভরুস্তারা হারাচ্চ্যুতা ইব মৌক্তিকাঃ
> সুরসুরতজক্রীড়ামূনাদ্দ্যুসদ্বিয়দঙ্গণম্।
> বহুকরকৃতাৎ প্রাতঃ সমার্জনাদধুনা পুন-
> র্নিরুপধিনিজাবস্থালক্ষ্মীবিলক্ষণমীক্ষ্যতে।।” (১৯।১৩)

বর্ণনার এই বৈশিষ্ট্যই কবিপ্রতিভার চরম রহস্য। শ্রীহর্ষের বাক্ শিল্প-চাতুর্য সর্বকালের কবিদের ঈর্ষার বস্তু। শিল্পিত ভাষা-প্রয়োগে শ্রীহর্ষ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর প্রযুক্ত শব্দরাজি বহু ক্ষেত্রে বাগ্‌বিধির স্তরে উন্নীত হয়েছে যেগুলি বর্তমানে প্রচলিত বাংলা প্রবাদ-প্রবচনেরই প্রতিধ্বনি। যেমন- মেদসাং ভরা বিভাবরী (১।৪১), দৃশা নিপীয় (১।৯১), কথমাস্যং দর্শয়িতাহে (৫।৭১), তব রসনা লজ্জতে (৫।১১৭), করে কর্ষতি (৯।৪৫), মুদমুদ্‌গিরন্তি (৯।২৬), চিত্তাতিথিতামবাপিতঃ (৯।৫৬), দৃষ্টিদানে তব বদ্ধমুষ্টিতা (৯।১০৯), জনাননে কঃ করমর্পয়িষ্যতি (৯।১২৫), দৃশা চুম্বতি (১৬।৬৯) ইত্যাদি। এরূপ অজস্র বাঙ্‌নির্মিতি শ্রীহর্ষের রচনাশৈলীর মূল্যবান সম্পদ।

অলংকার প্রয়োগে কবির অনায়াস দক্ষতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমন কোন অলংকার নেই যা শ্রীহর্ষ তাঁর মহাকাব্যে ব্যবহার করেননি। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রয়োগ করেছেন। উপমা অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনও বাস্তব উপমান ও বিমূর্ত উপমেয়কে নিয়ে (২/৯৪, ৯/৮৪), কখনো বিমূর্ত উপমান (২/৯১), শাস্ত্রীয় উপমান (৯/১২১, ৯/১১৮) দ্বারা উপমার বৈচিত্র্য সাধন করেছেন। বিবিধ উপমানের একত্র সমাবেশও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন-

"বিশেষতীর্থৈবিব জহ্নুনন্দিনী গুণৈরিবাজানিকরাগভূমিতা।
জগাম ভাগ্যেরিব নীতিরুজ্জ্বলৈবির্ভূষণৈস্তৎসুষমা মহার্ঘতাম্"।। (১৫/৫৪)

শ্লেষের দ্বারা উপমার বৈচিত্র্য এই শ্লোকে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে-

"অদোহয়মালপ্য শিখীব শারদো বভূব তুষ্ণীমহিতাপকারকঃ।
অথায্য রাগস্য দধা পদে পদে বচাংসি হংসীব বিদর্ভজাদদে"।। (৯/১৪)

অর্থাৎ শত্রুদের অপকারী এবং মিতভাষী নল, সর্পদের দুঃখজনক শরৎকালীন ময়ূরের ন্যায় এই কথা বলে নীরব হলেন। তারপর প্রত্যেক কথায় নলের অনুরাগ সৃষ্টি করে দময়ন্তী, পায়ে ও মুখে রক্তিমা-শোভিত হংসীর ন্যায় (মধুর) কথা বলতে লাগলেন। এই শ্লোকের 'শারদঃ, অহিতাপকারকঃ, আস্যরাগস্য, পদে পদে-এই পদগুলি শ্লিষ্ট। শিখীব, হংসীব-উভয়ক্ষেত্রে শ্রৌতী পূর্ণোপমা। শ্লিষ্ট পদ প্রয়োগের ফলে এই উপমা শ্লেষানুপ্রাণিতা। উৎপ্রেক্ষা শ্রীহর্ষের প্রিয় অলংকার। এই অলংকারের প্রয়োগ-প্রাচুর্যের জন্য কবি-কল্পনার উদ্দামতা প্রকাশিত হয়েছে। শ্লেষ ও রূপকানুপ্রাণিতা প্রতীয়মান ক্রিয়োৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ রয়েছে এই শ্লোকে-

"ফলানি পুষ্পানি চ পল্লবে করে
বয়োহতিপাতোদ্গতবাতবেপিতে।
স্থিতৈঃ সমাদায় মহর্ষিবার্ধকাদ্
বনে তদাতিথ্যমশিক্ষি শাখিভিঃ"।। (১/৭৭)

অর্থাৎ তপোবনবাসী দূরদর্শী মহর্ষিবৃন্দ বয়োতিপাতোদগতবাতবেপিত অর্থাৎ তরুণদশাপগমজনিত বাতকম্পিত করপুটে সুস্বাদু সুরম্য ফল কুসুম নিয়ে অভ্যাগত অতিথিজনের যেরূপ আতিথ্য অভ্যাস করেন, বিলাসবনবাসী দূরদর্শী শাখী সকলও কি ঐ বয়োতিপাতোদগতবাতবেপিত অর্থাৎ বিহঙ্গমগমনে ডদ্গত-পবন কম্পিত পল্লবরূপ করপুটে সুস্বাদু সুরম্য ফল, কুসুম নিয়ে অভ্যাগত নলনৃসিংহের সেরূপ আতিথ্য ঐ স্থবির ঋষিবর থেকে অভ্যাস করেছিল। এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রয়োগ-বাহুল্যে শ্রীহর্ষ তাঁর পূর্বসূরীদেরও অতিক্রম করেছেন, তিনি যথার্থই উৎপ্রেক্ষা কবি। তাই প্রখ্যাত সমালোচক এ.এন.জানি মন্তব্য করেছেন "The title 'Utpreksakavi' can be conferred upon Sriharsa without any hesitation".[৩] এছাড়া রূপক, অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত, সমাসোক্তি, কাব্যলিঙ্গ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিষম, অসঙ্গতি প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবির অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীহর্ষের রচনাশৈলীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শ্লিষ্ট পদ সন্নিবেশের দ্বারা দ্ব্যর্থক শ্লোক রচনা। দময়ন্তীকে শ্লেষকবি রূপে বর্ণনা করে শ্লেষাত্মক রচনায় কবি নিজের পক্ষপাতই প্রকাশ করেছেন (৩/৬৯)। ত্রয়োদশ সর্গে শ্লিষ্ট পদ সন্নিবেশে কবি দক্ষতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সর্গের অধিকাংশ শ্লোক দ্ব্যর্থক (১৩/৩-২৫, ২৮-৩১)। একটি শ্লোকের তো আবার পাঁচ রকম অর্থ। শ্লোকটি একই সঙ্গে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম এবং নল সম্পর্কে প্রযোজ্য। যেমন-

"দেবঃ পতিবির্দুষি! নৈষধরাজগত্যা

নির্ণীয়তে ন কিমু ন ব্রিয়তে ভব্যতা।
নায়ং নলঃ খলু তবাতিমহানলাভো
যদ্যেনমুজ্ঝসি বরঃ কতরঃ পরস্তে"।। (১৩/৩৪)

কিছু শ্লোকের ক্ষেত্রে কবি আবার (৪।১০১- ১০৮) প্রথমার্ধে অর্ধসমস্যার দ্বারা প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর সন্নিবিষ্ট করে তাঁর রচনাশৈলীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

রস পরিবেশনের ক্ষেত্রেও শ্রীহর্ষ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যদিও 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যে অঙ্গীরস শৃঙ্গার, তবুও মৌল রসের পরিপুষ্টির জন্য তিনি অঙ্গরস রূপে করুণ, বীর, হাস্য, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি রসের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। যেমন- রাজহংসের বিলাপে (১/ ১৩৫- ১৪২) করুণ, নলের যুদ্ধবীরতা প্রতিপাদনে (১। ৯-১৪) বীররস, ষোড়শ সর্গে বৈবাহিক ভোজসভায় অবসরোচিত হাস্যরস, সপ্তদশ সর্গে কলির উক্তিতে রৌদ্র রস, বিরহী নলের চিত্তবৃত্তি বর্ণনায় (১। ৮৪-৮৬) বীভৎস রস যথাযথ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

শ্রীহর্ষের রচনাশৈলীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পদলালিত্য। মহাকবি কালিদাসের উপমা অলংকার প্রয়োগে যেমন সর্বাতিশায়ী দক্ষতা, মহাকবি ভারবির রচনায় যেমন অর্থগৌরবান্বিত বাক্যের অজস্র সমারোহ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতেও তেমনি পদলালিত্যের বিচিত্র সমাবেশ। তাই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে-

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি এয়ো গুণাঃ"।। [৩]

নৈষধচরিতে কালিদাসের বর্ণনায় মত কল্পনা বৈভব নেই, নেই সর্বত্র প্রসাদ বা সুকুমার গুণের চিত্তচুম্বিনী চারুতা, ভারবির অর্থগৌরবের গৌরবোজ্জ্বল অভিব্যক্তিও এখানে অনুপস্থিত। তবুও কবির লেখনী নিঃসৃত বর্ণনা ললিতমধুর পদের প্রয়োগে পদলালিত্যের শ্রুতিসুখকর ঝঙ্কার সৃষ্টি করে। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের গীতিধর্মিতাই হল পদলালিত্যের মূল উৎস। ললিত বা কোমল পদ সন্নিবেশের দ্বারা রচনার গীতিধর্মিতা কাব্যের উৎকর্ষের কারণ এবং তা পাঠক বা শ্রোতার আহ্লাদের জনক। তাই কুন্তক বলেছেন-

"অপর্যালোচিতেহপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা।
গীতবদ্হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিধধাতি যৎ"।। (বক্রোক্তিজীবিত, ১/৩৭)

রচনার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যে শ্রীহর্ষপ্রতিভার সর্বাতিশায়ী বিলাস অনায়াস লক্ষ্য বলে নৈষধচরিতের পদলালিত্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে। প্রথম সর্গে নলের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীহর্ষ বলেছেন-

"অধারি পদ্মেষু তদঙ্ঘ্রিণা ঘৃণা ক্ক তচ্ছয়চ্ছায়লবোহপি পল্লবে।
তদাস্যদাস্যেহপি গতোহধিকারিতাং ন শারদঃ পার্বিকশর্বরীশ্বরঃ"।। (১/২০)

এই শ্লোকের প্রতিটি চরণেই রয়েছে ছেকানুপ্রাস। অনুপ্রাস অলংকারের বাহুল্য এবং প্রয়োগ কুশলতার জন্য যে গীতিধর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই পদলালিত্যের কারণ। উপমা, শ্লেষ এবং অনুপ্রাস অলংকারের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে পদলালিত্য দেখা যায় এই শ্লোকে-

"অদোহয়মালপ্য শিখীব শারদো বভূব তূষ্ণীমহিতাপকারকঃ।
অথাস্য রাগস্য দধা পদে পদে বচাংসি হংসীব বিদর্ভজাদদে"।। (৯/১৪)

অর্থাৎ শত্রুদের অপকারী এবং মিতভাষী নল, সর্পদের দুঃখ-জনক শরৎকালীন ময়ূরের ন্যায় এই কথা বলে নীরব হলেন। তারপর প্রত্যেক কথায় নলের অনুরাগ সৃষ্টি করে দময়ন্তী, পায়ে ও মুখে রক্তিমাশোভিত হংসীর ন্যায় (মধুর) কথা বলতে লাগলেন। এই শ্লোকের পূর্বার্ধে শ্রৌতী পূর্ণোপমা, শেষার্ধেও শ্রৌতী পূর্ণোপমা। শেষার্ধে আছে

অন্ত্যানুপ্রাস ও বৃত্তনুপ্রাস। তাছাড়া এই শ্লোকের ‘শারদঃ’, ‘অহিতাপকারকঃ’ ‘আস্যরাগস্য’, ‘পদে পদে’ এই পদগুলি শ্লিষ্ট। এই উপমাদি অলংকারের প্রয়োগ চাতুর্য এবং ললিতোচিত পদ-সন্নিবেশ যে সঙ্গীত মাধুর্য সৃষ্টি করেছে তা শ্রুতি সুখকর। শ্রীহর্ষের রচনায় গীতগোবিন্দের মত ‘কোমলকান্ত’ পদাবলী দুর্লভ। এখানে মূলতঃ অনুপ্রাসের শব্দসাম্যে সৃষ্টি হয়েছে শ্রুতিমাধুর্য। মাঝে মধ্যে কোমল পদসন্নিবেশ সৃষ্টি করেছে সংগীতের মধুর ঝংকার। এই গীতিময়তাই নৈষধচরিতের পদলালিত্যের মূল রহস্য। মহাকবি শ্রীহর্ষের বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির ফলশ্রুতি এই মহাকাব্য। ভাবপক্ষ অপেক্ষা কলাপক্ষের আধিক্য, শাস্ত্রীয় সন্দর্ভের প্রয়োগাতিশয্য, ক্লিষ্ট কল্পনার বাহুল্য, দীর্ঘ ও অনাবশ্যক বর্ণনবৈভব, অপ্রচলিত এবং নবনির্মিত শব্দের প্রয়োগ এই মহাকাব্যকে দুরুহ করে তুলেছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছাড়া শ্রীহর্ষের রচনার মর্মোদ্ধার করা, রসাস্বাদ করা অসম্ভব। এই মহাকাব্য যেন জরা-ব্যাধি-বিধ্বংসী রসায়ন। এই মহাকাব্যের রচনাশৈলী কবির বহুজ্ঞতায় ভাস্বর। তাই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে- “নৈষধং বিদ্বদৌষধম্”। শ্রীহর্ষের এই নৈষধচরিত কাব্য বিদ্বজ্জনের অজ্ঞানান্ধকার রূপ ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধ স্বরূপ। এই মহাকাব্যের যথার্থ অনুশীলনের জন্য মানসিক স্থিরতা, দৃঢ়তা এবং বৈদগ্ধ্য বিশেষ প্রয়োজন। কবি নিজেই বলেছেন- তাঁর কবিতা-কামিনীর রমণীয়তা বিদগ্ধ জনের মনে আনন্দরসের উল্লাস জাগায়, মন্দমতিদের অন্তরে নয় (২২/১৫২)।

মহাকবি শ্রীহর্ষ ভারবি প্রদর্শিত কাব্য রচনা রীতিকে মহনীয় উত্তুঙ্গতায় উন্নীত করেছেন। নৈষধচরিত কাব্যে শ্রীহর্ষের সর্বাতিশায়ী কবিপ্রতিভা এবং ধুরন্ধর দার্শনিক প্রজ্ঞার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটেছে। মহাকাব্যকে রমণীয় ও সহৃদয়-সংবেদ্য করে তুলতে যে সব উপাদান প্রয়োজনীয় তা সবই এই মহাকাব্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এছাড়া রচনারীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গীতিময়তার আবেশ। শ্রীহর্ষের শব্দসম্পদ সমুদাত্ত, স্বচ্ছ এবং ভাব-প্রতীতির অনুকূল। ভারবি এবং মাঘের দ্বারা বহুক্ষেত্রে প্রভাবিত হলেও শ্রীহর্ষ রস প্রতীতির প্রতিবন্ধক মনে করেই তাঁর রচনায় বন্ধাত্মক শ্লোক রচনা পরিহার করেছেন। নৈষধচরিতে শ্লেষ এবং যমকের বৈচিত্র্য থাকলেও তা বর্ণনার গতিকে অনুসরণ করে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কাব্যপাঠ তখনই চরিতার্থ হয় যখন চিত্তবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি যুগপৎ পরিতৃপ্ত হয়। শ্রীহর্ষের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হৃদয়ানুভূতি এবং বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তির সমানুপাত উপস্থিতি। আর এই বৈশিষ্ট্যই নৈষধচরিত মহাকাব্যকে মহত্ব দান করেছে। শ্রীহর্ষের সমস্ত বর্ণনীয় বিষয়ই মৌল বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ বিষয়ে সি. কুনহন্ রাজা মহোদয়ের সমীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য- “He (Sriharsa) describes only what are relevant to the context, he does not drag in points simply for securing an occasion for description, as is found in many of poems starting with Magha’s Sisupalabadha and continued in its many imitations.”[৪] শ্রীহর্ষের বর্ণনা মূল কাহিনির সঙ্গে যেভাবে যতখানি সঙ্গত, ভারবি এবং মাঘের বর্ণনা ততখানি নয়। আধুনিক কাব্য সমীক্ষকদের কেউ কেউ ‘নৈষধচরিত’ মহাকাব্যকে “the last masterpieces of industry and ingenuity”[৫] বলে মন্তব্য করেছে, আবার কেউ কেউ এই মহাকাব্যকে নিকৃষ্ট রুচি এবং অপকৃষ্ট রচনারীতির বিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৬] বস্তুত নৈষধচরিতের এই দোষ উদ্ভাবন চন্দ্রে কলঙ্ক আবিষ্কারেরই নামান্তর। ‘বিদ্বদৌষধ’ এই মহাকাব্যের ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে প্রয়োজন বৈদগ্ধ্যের, প্রয়োজন পান্ডিত্যের[৭]। কবির রচনাকে বুঝতে হলে কবির যুগ পরিবেশকে বুঝতে হবে। কবির সমকালীন পাঠকের রুচির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। শ্রীহর্ষের সমসাময়িক বা কিয়ৎ পরভাবী টীকাকারেরা কবির রচনার মূল সুরটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কখনো শ্রীহর্ষের প্রশস্তি, কখনো বা তাঁর মহাকাব্যের প্রশস্তি। টীকাকার গদাধর বলেছেন—

> “অন্যৈঃ কবিভিরক্ষুণ্ণাং পদারব্ধাং সুপদ্ধতিম্।
> সমাদায় কবিঃ শ্রেয়ঃ শ্রীমান্ হর্ষঃ প্রতিষ্ঠাতে।।”[৮]

শ্রীহর্ষ এবং তাঁর নৈষধচরিত কাব্যের এরূপ বহু প্রশস্তি প্রচলিত আছে। যে সকল সমালোচক শ্রীহর্ষের রচনায় দুরবগাহত্ব প্রতিপাদনে অথবা দোষাবিষ্করণে তৎপর, তাঁরা স্বচ্ছন্দ, প্রোদ্দাম, প্রবহমান শ্রীহর্ষ-কবিতা-কামিনীর

প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। নতুবা কিভাবে এরূপ প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি সেই মহান্ কবিবর বা তাঁর মহতী কৃতিতে বর্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১। নৈষধচরিতম্ (নবমঃ সর্গঃ), শ্রীদেবকুমার দাস, পৃষ্ঠা - xxiii।
২। ঐ।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা - xxvii।
৪। Survey of Skt. Lit, সি. কূনহন্ রাজা, পৃষ্ঠা - 147।
৫। HSL, S.K. De, পৃষ্ঠা - 325।
৬। "Judging by modern standard, an imparient western critic should stigmatise the work as a perfect masterpiece of bad taste and bad style." – S.K. De: HSL, P. 328।
৭। Survey of Sanskrit Literature, C. Kunhan Raja, পৃষ্ঠা – 136, 146-148।
৮। নৈষধচরিতম্ (নবমঃ সর্গঃ), শ্রীদেবকুমার দাস, পৃষ্ঠা – xxxiv।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। দাস, শ্রীদেবকুমার, নৈষধচরিতম্ (নবমঃ সর্গঃ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৬।
২। Krishnamachariar, N, History of Classical Sanskrit Literature, Tirumalai-tirupati devasthanams Press, Madras, 1937।
৩। নৈষধচরিত (পূর্বভাগ), মহাকবি শ্রীহর্ষদেব বিরচিত, শ্রীজগচ্চন্দ্র মজমদার কর্তৃক অনুবাদিত, গৌড়ীয় যন্ত্রে যন্ত্রিত, কলকাতা, ১৯১৯।
৪। নৈষধীয়চরিত – মহাকবি শ্রীহর্ষ বিরচিত, নারায়ণ রচিত 'নৈষধীয়বৈয়াকরণমহাপ্রকাশ', কবিরত্ন পন্ডিত শিবদত্ত সম্পাদিত, ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস, বোম্বে, ১৯২৭।
৫। Keith, A.B., A History of Sanskrit Literature, Clarendon Press, Oxford, 1928।
৬। Winternitz, M., A History of Indian Literature, Vol. 1 & 2, Ed. Motilal Banarasidass, Delhi, 1993।